কহবর লেখা

নলিনী বেরা

জঙ্গলের ধারে ধারে গ্রাম, গ্রামের ধারে ধারে জঙ্গল। কখনও বা জঙ্গলের মাঝে মাঝে গ্রাম, গ্রামের মাজে মাঝে জঙ্গল। জঙ্গলে-গ্রামে মেশামেশি, মেশামেশি। জ্যোৎস্না - পুলকিত-যামিনীতে যখন চাঁদের আলোর খই ফোটে, প্রস্ফুটিত খইয়ের জ্যোৎস্না ঠিক্‌রে এসে রদ্‌বদিয়ে মাটির বাড়ির 'পশুমাটি' অর্থাৎ বিলমাটি চর্চিত দেয়ালে 'কহবর' লেখে, 'কহবর লেখা' তার মানে চাঁল -গুঁড়ি- গোলা জল, আলতা-সিঁদুর, পুঁই-মেচ্‌ড়ি, আর সিমপাতার রস দিয়ে বিবাহবাসরের 'পাল্কী-সোয়ারি' কাজল লতা' 'জাঁতি', 'মাথার কাঁটা' 'কাঁকই' 'আঁকে, জ্যোৎস্না কী আর আঁকে, মেহা-মাদাল-চল্লা-আঁইশা গাছের ডালপাহার ফাঁক - ফোকর দিয়ে ঢুকে - পড়া চাঁদের আলোয় আগে থেকেই আঁকা দেওয়ালের 'চালচিত্র' কেবল উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়, পিড়িং পিড়িং করে পাশ দিয়ে আলো জ্বাহতে জ্বালতে উড়ে যায় 'বাঘ ঘুগ্‌নী' বা জোনাকি পোকা, অলস অপরাহ্নের মতো ভারি হতে থাকে জ্যোৎস্না, ছায়ায় ঢাকা পাতায় মোড়া 'অনুস্বার' 'বিসর্গ' 'চন্দ্রবিন্দু' 'খণ্ড ত (ৎ)' -এর মতো ছোট ছোট গ্রামগুলি— দোরখুলি, সুখজুরি, রুখনীমারা, ভালিয়াঘাটী, মুঢাকাটি, টটাসাহি, নুয়াসাহি, থুরিয়া, বড়োডাঙা, ডাঙাসাহি, কিয়াঝরিয়া, বিবিয়াড়িয়া, টিয়াকাটি-সব একে একে ঘুমিয়ে পড়ে, কট্‌কটি ব্যাঙ কিংবা রিঁ-রিঁয়া পোকা থেকে থেকে 'কট্‌কট্‌' ''রিঁ-ই-ই-ই'' ''রিঁ-ই-ই-ই'' করে কেবলই ডাকতে থাকে, তখন, ঠিক তখন মনে হতেই পারে— চরাচর খুব সুখেই আছে, তাবৎ মানুষের কোনো দুঃখটুঃখ নেই।

আগে আগে বড়োডাঙা গ্রামের অধিবাসী শশাঙ্ক বেহেরার অবশ্য তাই মনে হত, সে রাতভিত জ্যোৎস্নার ছায়ান্ধকারে ঢোল-কলমির বনের ভিতর দিয়ে গড়ানে নেমে যেত, সামান্য হেঁটে হাত বাড়ালেই সুবর্ণরেখা নদী, নদীজল। হাতে বড়জোর থাকত একটা চর্টের আলো। যতটা না পথঘাট দেখার জন্য, তারও চেয়ে বেশি নদীতে মৎস্যশিকার— অন্ধকারে নদীজলে টর্চের আলো ফেলে মাছ ধরার সে এক অদ্ভুত কৌশল! চর্টের নীলাভ আলো মাছের চোখে পড়লে বহন্তি জলেও খলবলে মাছ স্থির হয়ে যায়, নড়তে চড়তে পারে না আর। তখন ঝোপ বুঝে কোপ মারলেই হল, কেউ কেউ তো তরোয়ালের কোপ মেরেই মাছটাকে করে ফেলে দু-টুকরো, নদীজলে রক্তারক্তি কাণ্ড! শশাঙ্ক বেহেরা অতটা আবার নিষ্ঠুর নয়, চর্টের এফাকাস মাচের উপর ফেলে রেখে অন্য হাতে মাছটাকে খপ্‌ করে তুলে নেয় সে, তার যে 'জীবন্ত' ধরাতেই আনন্দ! এই কিছুদিন পূর্বেও সুবর্ণরেখা নদীতে ইলিশ উঠত, খান্দারপাড়া গ্রামের ঝাড়েশ্বর পানী আর মাধব পানী, দুই ভাই, নদী বুকে 'পাটা'য় দাঁড়িয়ে দিবারাত্রি অষ্টপ্রহর জাল ফেলত, দিনে তাদের গড়ে বত্রিশটা ইলিশেরও 'রেকর্ড' আছে। এখন সে - দিনকাল আর নাই, জিজ্ঞাসা করলে তারাও তের্চা করে বলে, ''আঘু তভু অনেক ইল্‌শা উঠ্‌থায় সুবর্ণরেখায়, অখন সে-ইল্‌শা কুটে আছে জানু? কলকাতায়!'' অর্থাৎ, আগে তবু অনেক ইলিশ উঠত সুবর্ণরেখায়, এখন সে-ইলিশ কোথায় থাকে জানিস? কলকাতায়।

শশাঙ্গ ভাবে, সে 'কহবর' ও কী আর এখন বিবাহ বাসরে মাটির দেয়ালে লেখা হয়? সেই 'আরশি' কাঁকই' 'জাঁতি' 'কড়ির চুবড়ি' 'মৌড়' 'কাজল লতা'? হয় না, হয় না। আগে আগে পাতিনা তালডাংরা মলতাবনী দৌউলবাড় বাছুরখোয়াড়, নিজের গ্রাম বড়োডাঙা তো আছে— আরও দূর দূর গ্রাম - নারদা-নিঘুই-চাঁদাবিলা থেকেও তার 'ডাক' আসত 'কহবর' লেখার। 'বাঁধাপণি'র আসরে অর্থাৎ বিদায়বেলায় বর-কনে যখন 'জোড়ের কাপড়ে' জোড়া লাগিয়ে পাশাপাশি বসে থাকে, ঘরসুদ্ধু লোক বাবা-মা কাকা-কাকী জেঠা-জেঠি আত্মীয় পরিজন হুমড়ি খেয়ে একের পর এক জ্বলন্ত প্রদীপের শিখায় হাত সেঁকে মাথার উপর ধানদূর্বা ছড়িয়ে উলু দিয়ে 'চুমা' খায়, আশীর্বাদ করে, ঝকঝকে কাঁসা কী পেতলের থালায় ঠং করে অথবা নীরবে আশীর্বাদীর অর্থ পড়ে, সম্পর্কে শালা-শালীদের কেউ একজন অধীর অপেক্ষায় লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে—কখন শেষ হবে 'বাঁধাপাণি', কখন থালার সমুদয় অর্থ সরিয়ে জল ঢেলে পা ধোয়ানো হবে বর-কনের, থালার পা-ধোয়া জলে 'কাঁকড়া' ধরতে কন তার 'ডাক' পড়বে, কাঁকড়া ধরার নাম করে সে ধরবে বন - কনের পায়ের যে - কোনও একটা বুড়ো আঙুল, উপযুক্ত বকশিস না পেলে কিছুতেই সে - আঙুল সে ছাড়বে না, তখন, ঠিক তখনও বর-কনের 'বাঁধাপাণি'র আসরে পিছনের দেয়ালে শশাঙ্ক বেহেরার 'মধুবনী আর্ট' -য়ের আদলে আঁকা 'কহবর -লেখা' জ্বল জ্বল করে, জ্বলজ্বল করে। একবার হলেও লোকের চোখ চলে যাবে সেদিকে, যাবেই। আসলে চালগুড়ি - পুঁইমেচড়ি- গিরিমাটি-আলতা-সিঁদুর সহযোগে 'বিলমাটি' দিয়ে 'ছঁচ্‌' দেয়া দেয়ালে কতক আঁকাজোকা, তবু তো লোকে বলে 'কহবর-লেখা'। লেখা, লেখা। বিবাহবাসরে যেন বর-কনের অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের আলেখ্যই লিখে দিত শশাঙ্ক বেহারা, ললাট - লেখা।

সেদিন আর নেই, তার রমরমা আজ প্রায় অতীত। তবু, এই তো কিছুদিন আগেও নদী যখন শুকনো, চারধারে বালির বাঁধ দিয়ে খাব্‌লা খাব্‌লা জলটুকু ঘিরে জলে হাজারটা 'গুড়মন' গছের রস মিশিয়েও 'সতীবাঁধা' সামান্য চুনোপুঁটি, ব্যাঙটুনিও পাওয়া যাচ্ছিল না আর, তখন সে শুরু করেছিল বাণিজ্য— 'মহুল' আর 'বাবুই দড়ি' কেনাবেচা। জঙ্গলের ভিতরে ভিতরে অবস্থিত মাহাত-করণদের গ্রামে গ্রামে গিয়ে 'মহুল' অর্থাৎ মহুয়ার বস্তা আর বাবুইদড়ির বাণ্ডিল 'গোস্ত' করে বড়খাঁকড়ির হাটে কিংবা আরও দূর দূর বারিপদা - ময়ূরভঞ্জের বাজারে বেচে আসত। ফিরতি পথে বনের ভিতর সাইকেল চালিয়ে আসতে গিয়ে মস্ত চাঁদ উঠত, চন্দ্রালোকিত বনের সুঁড়িপথের দুধারে অতঃপর মাহাত-তাঁতি-সাঁওতাল-কুমহার-কামহারদের গ্রাম, তাদের মাটির বাড়ির 'ছঁচ্‌' - দেয়া অর্থাৎ সাদা বিলমাটির ন্যাত্যা বুলানো দেয়ালে সাঁওতাল-মাহাত 'বিটিছানা'দের হাতের কতরকম কাজ ফুল-পাখি-লতাপাতা—তার 'কহবর লেখা'র থেকেও যে সরেস সরেস আঁকাজোকা সব! শশাঙ্ক বেহেরা ''ক্রিং'' ক্রিং'' বলে বাজিয়ে যেন শিল্পীদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেই সরসরিয়ে সাইকেল ছোটাত— ''আনি মানি জানি না—''

সেদিনটাও আর নেই, চাপা পড়ে গেছে। চাপা পড়ে গিয়েছিল দেয়ালগুলোও। রাজনীতিবাবুদের হাতে-লেখা, ছাপা ছবি ও পোস্টারে 'কুল্‌হি' রাস্তার দুধারে মাটির বাড়ির দেয়াল-ঢাকা পড়ে যেত, চাপা পড়ে থাকত মাহাত-সাঁওতাল-ভুঁইয়া-ভূমিজ-বাউরি 'বিটিছানা' 'বহুছানা'দের অত্যাশ্চর্য সব হাতের কাজ। একদিন - দু'দিনের জন্য তো নয়, বছরের পর বছর, দেয়ালের স্বত্ব দখল করে নিত পার্টিবাবুরা। 'মকর' 'বাঁদনা' 'সারুল' 'সহরায়' -এ বিল থেকে 'পশুমাটি' তুলে এনে মেয়েরা দেয়াল গাবিয়ে শুকনো করতে না

করতেই তারা এসে ইংরেজিতে কী সব লিখে 'দাগা' মেরে দিত, তাদের 'দাগা' দেখলে আর কেউ সেখানে 'দাগা' মারতে সাহস পেত না। 'আর্স্টিস্ট' বউড়ী-ঝিউড়ীদের আঁকার জন্য হাত নিসপিস করলেও হাত গুটিয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় কী?

'কহবর' বাদ, গিরিমাটি - পুঁইমেচড়ি-সিমপাতার দিনও শেষ পার্টিবাবুদের লেখা-জোখা পোস্টার সাঁটাও আপাতত বন্ধ — এখন তো প্রতিদিন দেয়ালে দেয়ালে, বিশেষত যাতায়াতের রাস্তার পাশের দেয়ালে সূর্যাস্তের আগেভাগে বেলা থাকতে আঁকতে হচ্ছে— আঁকতে হচ্ছে গোবরের নাদি দিয়ে তিন-তিনটে 'বেঁটে -বাঁটকুল' মানুষের প্রতিমূর্তি—মাঝের জন্য ভার কাঁধে, আগে-পিছে আরও দুজন, খালি হাতে: খালি হাতে, খালি হাতে।

নিজের বাড়ির দেয়ালে যেমন-তেমন, আশপাশের প্রতিবেশীর বাড়ি দেয়ালেও তিনমূর্তির ছবি এঁকে দিতে হচ্ছে শশাঙ্ককে—বাঁচতে তো হবে সবাইকেই! বাঁচার তাগিদে মরীয়া হয়ে 'কহবর - লেখা' হাত এখন গোবরের নাদি থাপছে দেয়ালে — বাঁচতে তো হবে! বাঁচা চাই!

দুই

'মহুল' আর 'বাবুই-দড়ি'র ব্যবসা ছেড়ে শসাঙ্ক কদিন 'কাজুবাদাম' আর 'জারা' ডালের কারবার ধরল। গ্রামের শেষে জঙ্গলমহালের উপান্তে কালচে - সবুজ কাজুবাদামের 'প্লানটেশান'। ফাল্গুন - চৈত্রে ময়লা - হলুদ ফুল আসে। ওই ফুল দেখেই কাজুর 'লিজ্' নিতে হয় জঙ্গল - বাহাদুরের কাছ থেকে। ফল ভালো হলে ভালো, নচেৎ হাঙ তো লাভ হাতের পাঁচ ফুঁজিটুকুও উঠে আসে না। বছর দুয়েক ভালোই লাভ করেছিল শশাঙ্ক। লোভে পড়ে পরের বছরগুলোর মার খেল। অতপর কাজু ছেড়ে 'আড়া' ধরা। 'আড়া' হল জঙ্গলের ভিতরে গাছের ডাল কেটে সীমানা চৌহদ্দি চিহ্নিত করে অনেকটা জায়গা জুড়ে তসরগুটির চাষ করা। ধানচাষ না পারলেও এ-চাষ লোধাশবররা ভালোই পারে, 'আড়া'র আড়তদার ছিল প্রকৃত অর্থে লোধারাই।

তা হোক, শশাঙ্ক বেহারার আড়ার প্রতি ত্যামন লোভ ছিল না, তার চোখ ছিল 'জারা'র দিকে। 'জারা' হল একপ্রকার বনজ বরবটি, বন - কুঁদরী বন-কাঁকরোলের ন্যায়। অবিকল গাঢ় সবুজ রংয়ের বরবটি! 'আড়া'র শুকনো ডালের মাচান বেয়ে আদিবাসী সৌন্দর্যে ও সতেজতায় ফনফনিয়ে বেড়ে ওঠে, তার পুরুষ্টু পুরুষ্টু বীজ অর্থাৎ 'জারা' ডাল খেতেও সুস্বাদু, বিকোয়ও খুব চড়া দামে। দুটো বেশি পয়সার মুখ দেখেছিল শশাঙ্ক, তাও তো 'ফেল' মারল! এখন জঙ্গলে ঢোকাই দুঃসাধ্য, বিপজ্জনক।

জঙ্গল ছেড়ে নদীর মাছ নয়, নদীধারের পালজমিনের খেড়ী-তরমুজ বাঁধাকপি-ফুলকপি আলুটা-মূলোটা চাষীদের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত কম দামে কিনে 'নদী সেপারে' রোহিনী, কুলটিকরী কী কেশিয়াড়ীর হাটে একটু চড়ার দামে বেচে দিয়ে আসে শশাঙ্ক। দামের তফাৎ ভালোই। আনাজের 'পাইকার' হিসাবে যৎকিঞ্চিৎ নামডাক হলেও শশাঙ্ক কিন্তু 'ফড়ে' নয়। ফড়ে নয়, ফড়ে নয়। গরুর গাড়ি করে আনাজ-পাতির 'চাঙারি' নিয়ে সে যখন কুস্তুরিয়ার বেগুনা-শ্বেতভেরেন্ডার ছায়াঘন পথ ধরে, পথের অদূরে ছোটনদী ডুলুঙের জল যখন রৌদ্রে পড়ে ঝিলিক দেয়, বাতাসে তির্ তির্ করে কাঁপে, চিল ডেকে ওঠে, ''চি-ল-কু-ঢ়-র্-র্-র্''—তখন হঠাৎ কী মনে করে গাড়ি ঘুরিয়ে দেয় শশাঙ্ক, ''নাহ্, এবার হাতিবান্দি ভিতর দিয়েই যাওয়া যাক!''

হাতিবান্দি গ্রামের ভিতর দিয়ে কিছুদূর গেলেই রোহিনীগড়ের 'বাবুঘর', 'বাবুঘর' অর্থাৎ জমিদারবাড়ি, গাড়ি থামিয়ে জমিদার বাড়ির ঠাকুরদালানে একটা আস্ত 'বৈতাল', দুটো ফুলকপি কী বাঁধাকপি নামিয়ে রেখে ঢিব্ করে সে প্রণাম করে, হয়তো তখনও দুর্গা 'মেড়ের' কাঠামোয় মাটিই পড়েনি, সবে খড় বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে! লেজুড় মুচড়ে আনাজগাড়ির গরুগুলোকে ছুটিয়ে দিয়ে শশাঙ্ক অতঃপর গান ধরে—''রাজার পঙ্খী উইড়া গেলে রাজা নতুন পঙ্খী বান্ধে। আর দুঃখীর পঙ্খী উইড়া গেলে দুঃখী শূন্য খাঁচায় কান্দেরে—''

তিন

রোহিনীর হাটে এসেছিল শশাঙ্ক, 'কাঁকুড়ে'র গাড়ি নিয়ে, 'কাঁকুড়' তার মানে বৃহদাকার শশা, তরকারি করার নিমিত্ত রোহিনী সি. আর. ডি হাইস্কুল হোস্টেলের ম্যানেজারই কিনে নিয়েছেন সিংহবাগ। বাকিটাও আধঘন্টার মধ্যে শেষ। দু-চাট্টা 'বুড়ো' বেরিয়েছিল —তাই এখন চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে গরুগুলো, খাক! হাট 'বুলতে' বেরুল শশাঙ্ক। মঙ্গল আর শুক্রু— সপ্তাহে দুদিন এখানে হাট বসে, হাটের পরিধি বাড়তে বাড়তে এখন ছাড়িয়ে গেছে 'ভ্রমরগড়'! রোহিনীগ্রামের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত 'ভ্রমরগড়' —সে এক আলাদা 'উপাখ্যান'! সেদিকে গেল না শশাঙ্ক, তার আগেই তাকে হঠাৎ করে টেনে নিল 'নদী-সেপারের' ধুরিয়া গ্রামের মনা পাতার। বলল, ''খবর শুনিছু রওা শশাঙ্ক?'' শশাঙ্ক বলল, ''হঁ, টিকে টিকে।'' অর্থাৎ একটু একটু। তারপর তাদের দুজনের ভিতর সুবর্ণরেখা নদীতীরবর্তী 'হাটুয়া' ভাষায় ফিস ফিস করে কথা হল। একটু একটু নয়, খবরটা চাউর হয়ে গেছে বেশ গভীর ভাবেই, এখন দাবানলের মতোই ছড়িয়ে পড়ছে হু হু করে! 'হাটুয়া' —তার মানে বাংলা -ওড়িয়া মেশামেশি এক চলিত ভাষা— রাজু, খণ্ডায়েৎ, সদ্গোপ, তেলি-তাম্বুলী, কারণ, উৎকল-ব্রাহ্মণদের ভাষা।

খবরটা এই—দিনের বেলা যেমন - তেমন, রাতের বেলা, বিশেষত রাত যত বাড়ে, শুন্শান হয়, কট্কটি ব্যাঙ কিংবা 'রিঁ-রিঁ-য়া পোকা'র ডাক যত মুখর হয়, নিকটবর্তী জঙ্গহমহালে দু-চাট্টা ভুঁড়া - শিয়াল অথবা বনমোরগের ডাক প্রহর গোনে, কর্ম্মক্লান্ত অবসন্ন মানুষ যখন গভীর ঘুমে ঢলে পড়ে, আচ্ছন্ন হয়, যখন তার আর কোনও 'সাড়' থাকে না, তখন, তখনই তারা আসে, সুবর্ণরেখা নদীর দক্ষিণতীরবর্তী তেঘরি - পায়রাকুলি-আসনবনী-হাতিমা৪রা-ধানসোলা- জামসোলা-পাতিনা-বাবুইচাটি-খুদ্মরাই, গোনো-না-কোনো গ্রামের 'কুল্হি-রাস্তায়' যেতে যেতে আচমকা কারোর-না - কারোর ঘরে 'ছামু'তে দাঁড়িয়ে পড়ে নাম ধরে হাঁক দিচ্ছে, সে হাঁকডাঁকে ঘুমের ঘোর ভেঙে সাড়া দিলেই 'মরণ'! ভোর হতে না হতেই তার মৃতদেহ পড়ে থাকছে পাঁচকাহিনা বড়খাঁকড়ি ঘোড়াটাপুর কমলাসোল নারদা-নিঘুইয়ের জঙ্গলে, চাঁদাবিলা-খড়িকামাথানী-গোপীবল্লভপুরের 'পিচ্' রাস্তায়, নচেৎ মহলী-সীতানালা-মুরলীর খালধারে, সুবর্ণরেখা নদীপাড়ে। প্রাণহীন, ধড়-মাথা বিচ্ছিন্ন হয়ে। রটনা—সংখ্যায় 'তারা' তিনজন, গ্রামের 'কুল্হি-রাস্তা'য় টায়ারের চটি - পায়ে নিশুতিরাতে বালি ছিটিয়ে মস্ মস্ করে হেঁটে যায়, মাঝের জন 'ভার-কাঁধে', আগে -

পিছে দুজন, খালি হাতে— । উচ্চতায় তারা খাটো— যাবে বলে 'বেঁটে বাঁটকুল'। কেউ কেউ বলছে, ''না, সংখ্যায় তারা ন'জন তেরজনও হতে পারে। জোড়ে জোড়ে নয়, তারা আসবে সব সময় বিজোড়ে।

মনা পাতরকে ছেড়ে শশাঙ্ক গেল চঁদপুরের চারু হাটুইয়ের কাছে। চুরু হাটুই হাটে এনেছে ক্ষেত্রে পুঁই, 'পাল' -য়ের বেগুন, গাছের পেঁপে-পেয়ারা। 'নদী-এপারে'র মানুষ ফলমূল খুব খাচ্ছে, তাদের তো ডর - ভয় নেই, তাদের তো রাতভিত কেউ এসে 'নাম ধরে' ডাকছেও না, তারা নাকে সর্ষে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে, যত আতঙ্ক 'নদী-সেপারে'। 'নদী-সেপার' 'নদী-এপার'। চারু হাটুইয়ের বুক ধ্বক্ ধ্বক্ করছে— কে জানে আজ, হয়তো আজ রাতেই 'তিনমূর্তি এসে দাঁড়াবে তারই ঘরে 'নাচদুয়ারে', 'তুলসী চাউরা'র কাছে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়বে যমদূতের গলায়, ''চারু! ও চারু হাটুই!! চারু-আ-আ-আ! খোল্ দরজা!!'' হয়তো সেও ঘুমের 'তাড়সে' দরজার পাল্লা খুলে মুখ ফস্‌কে ''কে'' ''কে'' বলে সাড়া দিয়ে ফেলবে। আর দিলেই তো—

''চুরু ভাই! শুনোট?''

''কে? কে?'' ঘোর ভেঙে চমকে উঠে একহাট লোকের মধ্যে প্রায় কেঁদে ফেলে সম্বিত ফিরে পেয়ে চারু হাটুই উত্তর করল, ''অঃ শশাঙ্ক!''

চার

গ্রামাঞ্চলে মেলা বা হাট-বাজারের গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে তো আর শহরের মতো দৈনিক 'বাজার' বসে না, কালীবাবুর বাজার বোসবাবুর বাজার বা বোষ্টমপাড়ার বাজারের মতো বস্তুত তার কোনও 'বাবুবাজার' নেই, আছে বড়জোর 'বাবুঘর'। সেই 'বাবুঘরের' তত্ত্বাবধানেই রোহিনীগ্রামে মঙলবার আর শুক্রুবার হাট বসে প্রতি সপ্তাহেই। কারণে - অকারণে কত লোক যে হাটে আসে। কেউ আসে কিনতে, কেউ আসে বেচতে। যার ক্ষেত আছে সে বেচতে আসে খেতের আলুটা মূলাটা, যা ক্ষেত নেই সে কিনতে আসে খেতের জিনিস, মুদিখানার জিনিস, তেলটা, নুনটা। যার ক্ষেত নেই, ক্ষেতের জিনিস কিনতেও আসে না, মুদিখানার জিনিস সে তো গ্রামের হীরালাল মুদীর দোকানে 'গোস্ত' করলেই হয়, বাস্তবিক পক্ষে সে কিছু কিনতেই আসে না, সে আসে দেখতে। দেখতে 'খুকড়া-লড়াই' 'সার্কাস-বাজি।' হা-ঘরে বাজিকররা টিকিট কেটে 'সার্কাস' দেখায়— 'বাঁশবাজি' 'দড়িবাজি' 'চিটিংবাজি'র খেল্। 'খেল্ খতম পয়সা হজম।

রোহিনী হাটের পশ্চিমে ডুলুংয়ের ধারে ইস্কুলের মাঠে সার্কাসের তাঁবু পড়েছে। তার ধারে কাছেই 'রী' -তে হচ্ছে 'খুকড়া - লড়াই' অর্থাৎ মোরগ-লড়াই। এসব দেখে শুনে কে বলবে— অনিতদূরে 'নদী-সেপারে'র মানুষ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতে না হতেই ঘনায়মান অন্ধকারে রাতের গভীরে ভ্রাম্যমান 'ত্রিমূর্তি'র হিমশীতল ডাকের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে! গুনছে, প্রহর গুনছে। কে জানে আজ কার পালা! বলা মুস্কিল!

'নদী-সেপারে'র শশাঙ্ক একফাঁকে সার্কাস ও দেখল, দেখল 'খুকড়া-লড়াই'ও। 'নদী - সেপারে'র মূঢ়াকাটি থেকে এসেছে ঝানু 'কাক্তার' কমলেশ্বর মাহাত। লড়াইয়ের মোরগটা কোঁচড়ে চেপে সে বসে আছে 'উধাস' হয়ে চুপটি করে। খেলায় আজ তার আগ্রহ নেই।

ঘুরতে ঘুরতে তার কাছে উপস্থিত হয়ে কমলেশ্বরের মোরগটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করল, ''আজ কী হাতেই ফিরবে কাৎকার?''

কোঁচড়ে এতক্ষণ চেপে রাখা লড়াইয়ের মোরগটার ঠোঁট ফাঁক করে একদলা থুতু গিলিয়ে কমলেশ্বর মাহাত যেন স্বাগতোক্তি করল, ''কার কপালে কী আছে বলা মুস্কিল!'' বলে পরক্ষণেই মাটিতে থাপ্পড় মেরে বলল, ''কিন্তু বাঁচতে তো হবে! বাঁচা চাই!''

''হাঁ, ওইটাই করা কাৎকার, বাঁচতে তো হবে! বাঁচা চাই!''

আসলে গাড়ির গরুগুলোকে বিশ্রাম দিয়ে হাটময় ঘুরে ঘুরে মায় সার্কাস দেখে 'খুকড়া-লড়াই'য়ের ময়দানে উপস্থিত হয়ে শশাঙ্ক বেহেরাও বেঁচে থাকার কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টায় রাত ছিল। চারু হাটুইয়ের মতো তার বুকও যে ধ্বক্ ধ্বক্ করছে— 'মাঝের জন ভারকাঁধে, আগে - পিছে দুজন খালি হাতে', বেঁটে বাঁটকুল ওই তিনসঙ্গী আজ যদি তার দরজায় এসে কড়া নেড়ে ডাক দেয়— ''শশাঙ্ক হে! ওহে শশাঙ্ক হে-এ-এ-এ'' —তখন তার বেলা? তার উপর কমলেশ্বর মাহাতর মুখ থেকে যখন শুনল গতরাতে ডাক দিয়ে নিয়ে গেছে জামসোলার ভূধরকে, আজ তার লাশ পাওয়া গেছে সিঁধুইয়ের জঙ্গলে— তখন তার বুকের ধুক্‌পুকনি উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল।

গ্রাম্যহাট যেন 'পিঁয়ো চেঁড়ে'র মতো বিপদের খবর বহন করে নিয়ে এসে মুখ থেকে মুখে ছড়িয়ে দেয়, মুহূর্তে 'গুজব' হাট থেকে তল্লাটময় ছড়িয়ে পড়ে, তেমনি হাটও আবার পরিত্রাণের উপায়ও বাৎলে। 'পিঁয়ো চেঁড়ে' হল 'নিশান পাখি', যে কী না 'শিকার দিশমে' যাওয়া সাঁওতাল ছেলের জঙ্গলে আক্রান্ত হওয়ার দুঃসংবাদ বহন করে নিয়ে এসে তার মায়ের চুল ধরে টেনে জানান দেয়। আজকের হাটও 'পিঁয়ো চেঁড়ে'র ন্যায় সঙ্কটমোচনের 'নিশান' দিল।

হাটের পশ্চিমে 'সার্কাসের তাঁবু' আর 'খুকড়া-লড়াই'য়ের মাঠ থেকে দিশাহীনভাবে শশাঙ্ক যখন হাটের মাঝখানে এল তখন হাটের রকমসক তুঙ্গে উঠেছে। মোহিনীমোহন সাউরে দোকানে ভিড় উপছে পড়েছে। সামনে 'পরব', তাই বিক্রি হচ্ছে 'মোহিনী মিলের' ধুতি, মুদীখানার তৈজস, গুড়-পাটালি—

খ্যাপা শ্রীমন্তই হাত ধরে টানল, ''এই য্যা শশাঙ্ক, শুনছু?''

''কী?''

''আর কারেও বলার দরকার নাই—''

বলেই শ্রীমন্ত যা বলল তাই এইরকম— সূর্যাস্তের আগে দিনের আলো থাকতে থাকতেই রাস্তার দিকের বাড়ির দেয়ালে গোবর দিয়ে আঁকতে হবে তিনটি 'বেঁটে-বাঁটকুল' মানুষের ছবি— 'মাঝের জন ভার কাঁধে, আগে-পিছে দুজন, খালি হাতে'। পরিক্রমায় বেরিয়ে 'তারা' যখন রাতের আলো-আঁধারিতে গৃহস্থের দেয়ালে আঁকা ওই ছবি দেখবে তখন উদ্দিষ্টের নাম ধরে আর

'তারা' ডাকবে না, 'ধর্মের রাস্তা' ছেড়ে আর 'তারা' গৃহস্থের উঠোনে পা রাখবে না। সমূহ বিপদের সম্ভাবনাও আর থাকবে না, কেটে যাবে। তবে তা করার প্রতিদিনই করতে হবে দিনের আলো নিভে যাবার আগে আগে, সায়াহ্নে নয়, অপরাহ্নে।

অপরাহ্নে, অপরাহ্নে

পাঁচ

আর বিন্দুমাত্র দেরি করেনি শশাঙ্ক, গাড়ি 'জুতে' ফেলল। 'শর্টকার্ট' করতে আর রোহিনীগড়ের 'বুবুঘরের' ওদিকেও গেল না, কুস্তুড়িয়া পথ ধরল। ডুলুং নদীর ধার দিয়ে বট-অশ্বত্থের ছায়ায় ছায়ায় তার গাড়ি চলল। 'বেলা' এখনও ঝিরি ঝিরি হয়নি, রৌদ্রের তেজ যথেষ্টই আছে। একটু শীত শীত ভাব হাওয়ায়। গরুবাগালরা নদীধারে গরু ছেড়ে রেখে ডাং-গুলি খেলছে, খেতে 'কাতি' 'দাঁড়িয়াবান্দি'। মাঠ ঘাট ছেড়ে কাক-গুয়েবনি-চটা-চড়ুই এখনও গাছে ঝোপেঝাড়ে উঠে যায়নি। তার মানে 'বেলা' আছে অএনকটাই। তার মানে 'বেলা' আছে ।এনকটাই। তার মানে সূর্যাস্থের আগেই সেই বাড়ি পৌঁছে যাবে—ওই তো পরের পর দু-দুটো নদীর হাঁটুজল, মাঝখানে 'কদোপালের' চর, ওধারে মুগ-চনার ক্ষেত, কুমোরদের 'মাটিখানা' পেরিয়েই তাদের গ্রাম, বাড়ি— তারপর তো 'কহবর' - লেখা হাত মাটির দেয়াল সাফ- সুতোরো করে অবলীলায় গোবরের নাদি থেপে থেপে এঁকে ফেলবে তিন-তিনটে মানুষের প্রতিমূর্তি — 'মাঝের জন ভরা কাঁধে, আগে পিছে দুজন, খালি হাতে'। হ্যাজুড় মুচড়ে গরুগুলোকে ছুটিয়ে দিল শশাঙ্ক, তার উপর তার গরুগুলোও সরেস—এইটুকু পথ 'হুঁক্‌রে' চলে যাবে!

'বাজে-শিমুল' অর্থাৎ বাজে-পড়া শিমুলগাছের তলা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে এখন। যেতে যেতে শশাঙ্কর মনে পড়ছে মহাভারতে পনা অর্জুনের জয়দ্রথ বধের কথা। গ্রামে - ঘরে কাশীরাম দাসের মহাভারত কার না পড়া একটু - আধটু— দু-এক ছাঁদ তো শশাঙ্কের কণ্ঠস্থ! অভিমন্যুর মৃত্যুতে শোকহত অর্জুনের প্রতিজ্ঞা— ''বিনা জয়দ্রথ-বধে সূর্য্য অস্ত হয়। অগ্নিতে শরীর ত্যাগ করিব নিশ্চয়।।" যুদ্ধক্ষেত্রে যখন অর্জুন - জয়দ্রথের তুমুল 'রণ' চলছে, তখন আচম্বিতে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। উল্লসিত জয়দ্রথ অর্জুনকে তার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়ে দিল, কৌরবদলও আনন্দে নৃত্য করল। এমন সময় শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে ঢাকা-পড়া সূর্যের প্রকাশ ঘটল— ''দুই দণ্ড বেলা আছে গগন মণ্ডলে। দেখিয়া হইল ত্রাস কৌরবের দলে।।" 'বেলা'র দিকে তাকিয়ে শশাঙ্কেরও মনে হল—দু'দণ্ড বেলা তো আছেই, এখনও রৌদ্রের তেজ কী! এর মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যা কিছু করার করে ফেলতেই হবে, নচেৎ 'ডাক' আসবে 'শেষ ডাক'। কিন্তু বাঁচতে হবে! বাঁচা চাই!

ডুলুং নদীর হাঁটুজল পেরিয়ে গাড়ি উঠল কদোপালের চরে। সূর্যের দিকে চোখ রেখে গাড়ি ছোটাচ্ছে সে। চরে আকন্দ কাঁটাকুল আর 'পিট্‌না-সিজে'র সমাহার, মাঝে মাঝে বারি স্তূপ, গাড়ির 'লিকে' ধুলো উড়ছে, ধুলো উড়ছে। ওই দেখা যাচ্ছে গ্রাম—খান্দারপানা বড়োডাঙা থুরিয়া দেউলবাড়, রামেশ্বর জীউর মন্দির, মন্দিরের সাদা পলেস্তরা করা চূড়া, পিতলের ঘট— রৌদ্রে জ্বলজ্বল করছে, বাতাসে খল্‌খল্ করছে। নাহ্ বেলা এখনও যথেষ্টই আছে, চিন্তার কিছু নেই। শশাঙ্ক নিশিন্তে ক্লাস 'ফাইভ' কী 'সিক্স' -এ পড়া কবিতা আউড়ালো গুনগুন করে— ''ওই যে গাঁ-টি যাচ্ছে দেখা আইরি ক্ষেতের আড়ে, প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়াঝাড়ে—"

সবুজ কেয়াঝাড় আর কোথায়! গ্রামগুলোর পশ্চাদ্ভাগ আঁধার করে রেখেছে তপোবন জঙ্গলমহাল, পাঁচকাহিনা-বড়খাঁড়ি-নারদা-নিঘুই-বনশিরষির বিস্তৃত বনভূমি, যার ভিতরে ভিতরে 'অনুস্বার' 'বিসর্গ' 'চন্দ্রবিন্দু' 'খণ্ড ত (ৎ)' -র মতো গ্রামগুলি-দোরখুলি, সুখজুড়ি, রুখনীমারা, ভালিয়াঘাটী, মুঢ়াকাটি—যার অনতিদূরে দূরে তিনরাস্তার মোড়ে, শালগাছের তলায়, বাবুই ঘারেস জঙ্গলে গলাকাটা মাথা থ্যাঁতলানো উপুড়-কার 'চিৎ-করা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা 'নিশর ডাক পাওয়া' মানুষের মৃতদেহ! আঁতকে উঠে গাড়ি ছোটাতে গিয়েই শশাঙ্ক দেখল— গাড়ির 'ধুরি'টা হঠাৎ ভেঙে গেল মচ্ করে!

গাড়ি থেকে নামতেই হল শশাঙ্ককে, আ নেমেই দেখল— নদী-বালিতে সে শুধু একা নয়, হাটফেরত গাদাগুচ্ছের মানুষ ঘরের দিকে বালি ছিটিয়ে মস্ মস্ করে দ্রুতগতিতে হেঁটে চলেছে, 'বেলা'র দিকে দেখছে আর দৌড়ুচ্ছে—ওই তো গাড়ি নিয়ে ধুরিয়ার মনাপাতর, চঁদপুরের চারুহাটুই, খান্দারপাড়ার রজনী বেহেরা— কে নেই? যে 'কম্‌পিটিশন' চলছে ঘরে ফেরার। ঘরে ফেরার, ঘরে ফেরার। তবে কী সবাই জেনে গেছে 'বাঁচার উপায়'? বাঁচতে তো হবে সবাইকেই! বাঁচা চাই! আর সেময়ই কী না শশাঙ্কর গাড়িটা করল 'বেগেড় বাঁই', আচমকা ধুরিটা ভেঙে গেল মাঝ বরাবর!

'ঠেকনো' খুঁজেহ এমন ধুরিটা জুড়তে, ধু ধু বালিয়াড়িতে আধপোড়া মড়াকাঠ ছাড়া আর কাঠ কোথায়? তাই খুঁজে পেতে জুড়ে ফেলল শশাঙ্ক। ততক্ষণে তাকে 'কম্‌পিটিশনে' হারিয়ে একে একে চলে গেছে সবাই— থুরিয়ার মনা পাতর, চাঁদপুরের চারুহাটুই, মৃঢ়াকটির কমলেশ্বর—কেউই, —কেউ-ই আর নদীবালিতে পড়ে নেই।

ঝিল্ ঝিল্ করতে করতে এতক্ষণে বেলাও পড়ে গেল। তবু, দ্রুত হাত লাগিয়ে গাড়ি জুততো গিয়ে শশাঙ্ক দেখল— দড়ি খুলে গাড়ির 'বাঁয়া' গরুটাও উধাও!

অবিকল মহাভারতে 'কর্ণের রথচক্রগ্রাসের' ছবির মতো গাড়ির চাকা আঁকড়ে অসহায় ও ভয়ার্ত শশাঙ্ক নদীবালিতে বসে থাকল। তার আর গরু-খোঁজার আগ্রহটুকুও নেই। সায়েহ্নে অন্ধকার গাঢ় হয়ে নেমে আসছে। যে- কোনও সময় 'তিনমূর্তি'ও নামতে পারে।

এই প্রথমদিন 'ডিস্‌কোয়ালিফাই', করা ছাড়া গোবরের নাদি দিয়ে দেয়ালে– দেয়ালে 'তিনমূর্তি'র ছবি আঁকায় শশাঙ্কে আজ পর্যন্ত আর কোনও কামাই নেই। —বাঁচতে তো হবেই! বাঁচা চাই!